أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৫৪। www.motaher21.net

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

" ন্যায়-বিচার"

" Justice"

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

সুরা: আন্-নহল

আয়াত নং :-90

তাফসীর :

এ ছোট্ট বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরতা। দু'টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক, লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সমতা থাকতে হবে। দুই, প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে "নিসফ" "নিসফ" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোন কোন দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোন কোন দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবি ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহসান বা পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া--- এ হচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহসান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহসান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় মেপে মেপে আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্টর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবে না ঠিকই কিন্তু ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও মঙ্গলাকাংখার মত জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ইহসান করার একটি বিশেষ ধরণ নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবে না বরং একই সঙ্গে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহর শরীয়াত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোন সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারে না যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের

সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত-কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার হয় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয়-স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী ﷺ তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতা-মাতার, তারপর স্ত্রী-সন্তানদের, তারপর ভাই-বোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোন দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতখানি অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পুতঃ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

ওপরের তিনটি সৎ কাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা (فَحْشَاءِ) । সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মুহররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সম্মুখে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জনসমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি (مُنْكَرِ) । এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল খারাপ বলে আসছে এবং আল্লাহর সকল শরীয়াত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।

তৃতীয় জিনিসটি জুলুম-বাড়াবাড়ি (بَغْيِ) । এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

[১] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে জানিয়েছিলেন যে, কুরআনে সবকিছুর বর্ণনাই স্থান পেয়েছে, সে কথার সত্যায়ণ স্বরূপ এ আয়াতে এমন কিছু আলোচনা করছেন যা সমস্ত বিধি-বিধানের মূল ও প্রাণ [ফাতহুল কাদীর] তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, তিনি আদলের নির্দেশ দিচ্ছেন। মূলত: (عدل) শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও (عدل) বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভেতরে সমান হওয়া দ্বারা (عدل) শব্দের তাফসীর করেছেনে। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কারও মতে আদল হচ্ছে, ফরয। কারও নিকট, আদল হচ্ছে, ইনসাফ। তবে বাস্তব কথা এই যে, (عدل) শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তার আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেননা কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ তেমনি কোন কিছুতে কমতি করাও খারাপ [ফাতহুল কাদীর]

[২] আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, ইহসান করা বস্তুত: (الْإِحْسَانِ) -এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। যাওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমন, অতিরিক্ত সাদকা। ফাতহুল কাদীরা ইমাম কুরতুবী বলেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরীল'-এ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদাতের ইহসান। এর সারমর্ম এই যে,

আল্লাহর ইবাদাত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এ স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। [ফাতহুল কাদীর]

[৩] আয়াতের এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। আত্মীয়দের দান করা। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,"আত্মীয়কে তার প্রাপ্য প্রদান কর " [সূরা আল-ইসরাঃ ২৬]

বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা: তাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করা। [ফাতহুল কাদীর] ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর]

[৪] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেনঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেনঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং যুলুম ও উৎপীড়ন। এ আয়াত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এটি হচ্ছে কুরআনুল কারমের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত । [ইবন কাসীর] কোন কোন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলিম হয়েছিলেন। উসমান ইবনে মযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তার উপর ওহী নাযিলের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেনঃ আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। উসমান ইবনে মযউন বলেনঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩১৮]

[৫] ওপরের তিনটি সৎকাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, "ফাহশা"। যার অর্থ অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা। কথায় হোক বা কাজে। [ফাতহুল কাদীর] প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর তাকেই বলা হয় অশ্লীল। যেমন কৃপণতা, ব্যাভিচার, উলঙ্গতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্বসমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারীপুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

[৬] নিষিদ্ধ দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মুনকার তথা দুস্কৃতি বা অসৎকর্ম। যা এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা শরীআত হারাম করেছেন। যাবতীয় গোনাহই এর অন্তর্ভুক্ত। কারও কারও মতে এর অর্থ শির্ক। [ফাতহুল কাদীর]

(৭) নিষিদ্ধ তৃতীয় জিনিসটি হচ্ছে, (بغي) শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, যুলুম। কারও কারও মতে, হিংসা-দ্বেষ। মোটকথা: এর দ্বারা যুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা। তা আল্লাহর হক হোক বা বান্দার হক। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে (بغي) ও (فَحْشَاءِ) ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاءِ কে পৃথক ও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাঁর বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, সীমালঙ্ঘন ও অসৎ কাজ করতে। الْعَدْلِ এর শাব্দিক অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ করা ও অবিচার না করা। আদল আল্লাহ তা'আলার হকের ক্ষেত্রেও করতে হবে এবং মানুষের হকের ক্ষেত্রেও করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার যত হক রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায় করে দেয়াই হল আদল। তা আর্থিক হোক, শারীরিক হোক বা অন্য যে কোন হক হোক। বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং শিথিলতাও করা যাবে না। অনুরূপ আদল এর অন্যতম একটি অর্থ হল ন্যায়বিচার করা। অর্থাৎ বিচারের ক্ষেত্রে কারো পক্ষপাতিত্ব না করা।

আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার সম্পর্কে বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓي اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰي)

“হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাক; কোন সম্প্রদায়ের শত্রু“তা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না, তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।” (সূরা মায়িদা ৫:৮)

ইহসান অর্থ হল সদাচরণ, ক্ষমা ও সহানুভূতি দেখানো এবং অনুগ্রহ করা। অর্থাৎ আবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার পরেও এবং যথাযথ হক দিয়ে দেয়ার পরেও অতিরিক্ত কিছু করা বা দেয়া। যেমন কোন শ্রমিকের প্রাপ্য একশত টাকার সাথে দশ টাকা বেশি দিলেন, এটা তার প্রতি ইহসান। আল্লাহ তা'আলা সদাচরণ সম্পর্কে বলেন:

(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ)

“তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না।” (সূরা ক্বাসাস ২৮:৭৭)

হাদীসে এসেছে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء

জমিনে যারা রয়েছে তাদের প্রতি রহম কর আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে রহম করবেন। (তিরমিযী হা: ১৯২৪, সহীহ)

ইহসানের অন্যতম আরেকটি অর্থ হল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদত করা এবং সুন্দরভাবে তা সম্পন্ন করা। হাদীসে এসেছে:

(أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)

তুমি এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছো, যদি না দেখতে পাও তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫০, সহীহ মুসলিম হা: ৮)

পূর্বে আদলের আলোচনা করার পর এখানে আবার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা।

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজনের হক সম্পর্কে বলেন:

(فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰي حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ)

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারাই হল সফলকাম।" (সূরা রূম ৩০:৩৮)

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন, আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫৯৮৭)

আর অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার তো কোন সীমা নেই। চিত্ত বিনোদন, সংস্কৃতি ও প্রগতির নামে আজ অশ্লীলতা, নোংরামী ও বেহায়াপনা লাগামহীন হয়ে গেছে। অশ্লীলতা ও অসৎ কাজ (মানুষের বিবেকও বলে দেয় যে) কক্ষনোই ভাল নয়।

আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা, অসৎ কার্য ও সীমালংঘন না করার ব্যাপারে বলেন:

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)

“বল: নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ ও অন্যায় বিরোধিতা।” (সূরা আ'রাফ ৭:৩৩)

وَالْبَغْيِ অর্থ সীমালংঘন ও অত্যাচার। শরীয়ত যে সীমারেখা দিয়েছে তার বাইরে যাওয়াই হল সীমালংঘন করা। অন্যের হক নষ্ট করাও সীমালংঘন করার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুপাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের সাথে সদাচরণ করা, আত্মীয়তার হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং মন্দ ও অশ্লীলকার্য পরিহার করা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সৎ কাজ করতে হবে, অসৎ কাজ করা যাবে না।

২. কোন কিছুর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

৩. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে হবে।

৪. সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ন্যায় নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৫. অশ্লীল কার্য পরিহার করতে হবে।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলে আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, নিজেদের অঙ্গীকার পাকা-পোখত করার পর তা ভঙ্গ করো না, যেহেতু তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

৯১ নং আয়াতের তাফসীর:

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যদি কোন বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ হয় তাহলে তা যেন পূর্ণ করে। এ ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে হতে পারে, অথবা বান্দা ও অন্য কোন মানুষের সাথে হতে পারে। ওয়াদা ভঙ্গ করা কোন মু'মিন ব্যক্তির কাজ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ)

"আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা আন'আম ৬:১৫২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا)

"প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা ইসরা ১৭:৩৪)

আর আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করছেন যেন তারা ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ না করে। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ক্ষতি নিজের ওপর বর্তাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰي نَفْسِهٖ ج وَمَنْ أَوْفٰي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا)

"সুতরাং যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার ওপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।" (সূরা ফাতহ ৪৮:১০)

এক প্রকার শপথ হল যা কোন কথা অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করার জন্য করা হয়। আর দ্বিতীয় হল যা অনেকে কোন সময় শপথ করে বলে 'আমি এ কাজ করব অথবা করব না'। এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে তোমরা শপথ করে আল্লাহ তা'আলাকে জামিন করেছ, অতএব এখন তা ভঙ্গ করো না। বরং সে অঙ্গীকার পূরণ কর, যার জন্য তুমি শপথ করেছ। কারণ দ্বিতীয় শপথের ব্যাপারে হাদীসে আদেশ

করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য শপথ করে সে যদি বুঝে যে, বিপরীত করলে তার মঙ্গল হবে তাহলে তার উচিত হবে মঙ্গল কাজে জড়িত হওয়া এবং শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দেয়া। যারা শপথ করার পর ভঙ্গ করে তাদের একটি উপমা দেয়া হয়েছে, তা হল কোন নারী সূতো মজবুত করে পাকানোর পর খুলে নষ্ট করা যেমন, শপথ করার পর ভঙ্গ করাও তেমন।

(تَتَّخِذُوْنَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا)

অর্থাৎ একজন অন্য জনের থেকে অধিক লাভবান হবার জন্য শপথকে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনাস্বরূপ ব্যবহার করে থাক? এরূপ করো না। অতএব কোন বিষয়ে ওয়াদা ও শপথ করার পর তা পূর্ণ করতে হবে, ভঙ্গ করা যাবে না। কারণ ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমনটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। মুনাফিকের আলামত তিনটি তন্মধ্যে একটি হল ওয়াদা ভঙ্গ করা (সহীহ বুখারী হা: ৩৩-৩৪, সহীহ মুসলিম হা: ৫৮-৫৯)

মূলত আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন কে বিধান লঙ্ঘন করে; আর কে সংরক্ষণ করে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না।

২. শপথ করার পর তা পূর্ণ করতে হবে।

৩. দুনিয়ার কৃতকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

সুরা: আন্-নহল

আয়াত নং :-92

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِیْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًاؕ تَتَّخِذُوْنَ اَیْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَیْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِیَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍؕ اِنَّمَا یَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖؕ وَ لَیُبَیِّنَنَّ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মতো না হয়ে যায় যে নিজ পরিশ্রমে সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে। তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে এক দল অন্য দলের তুলনায় বেশী ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অঙ্গীকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মতবিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।

তাফসীর :

এখানে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অঙ্গীকারকে তাদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে সেগুলো মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এক মানুষ আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছে। এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দুই, একজন বা একদল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অঙ্গীকার করেছে। এর ওপর আল্লাহর কসম খেয়েছে। অথবা কোন না কোনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজের কথার দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ। তিন, আল্লাহর নাম না নিয়ে যে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপরের দু'প্রকার অঙ্গীকারের পরবর্তী পর্যায়ের। তবে উল্লিখিত সব কয়টি অঙ্গীকারই পালন করতে হবে এবং এর মধ্য থেকে কোনটি ভেঙে ফেলা বৈধ নয়।

এখানে বিশেষ করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে। এ ধরনের অঙ্গীকার ভঙ্গ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরাও একে সৎ কাজ মনে করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাহবা কুড়ায়। জাতি ও দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হতে দেখা যায়। এক জাতির নেতা এক সময় অন্য জাতির সাথে একটি চুক্তি করে এবং অন্য সময় শুধুমাত্র নিজের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তা প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে অথবা পর্দান্তরালে তার বিরুদ্ধাচরণ করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সত্যনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তারাই সচরাচর এমনি ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে শুধু যে সমগ্র জাতির মধ্য থেকে কোন নিন্দাবাদের ধ্বনি ওঠে না তা নয় বরং সব দিক থেকে তাদেরকে বাহবা দেয়া হয় এবং এ ধরনের ঠগবাজী ও ধূর্তামীকে পাকাপোক্ত ডিপ্লোমেসী মনে করা হয়। আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকটি অঙ্গীকার আসলে অঙ্গীকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো কিয়ামতের দিন হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই কেউ সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ পুরোপুরি গোমরাহ ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোনভাবে নিজের গোমরাহ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অঙ্গীকার ভংগ, মিথ্যাচার ও প্রতারণার অস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না। যদি সে এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা কেবলমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই সত্যবাদিতার দাবী করে না বরং কর্মপদ্ধতি ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেও সত্য পথ অবলম্বন করতে বলে। বিশেষ করে যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, তারা যেহেতু আল্লাহর পক্ষের লোক এবং তাদের বিরোধী পক্ষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাই সম্ভাব্য যেকোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে একথা বলা হয়েছে। তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন এবং অঙ্গীকার পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি-নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই। তাদের সাথে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এজন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না বলে তারা মনে করতো।

وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَلٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অবশ্যই এক উম্মাত করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে গুমরাহ্ করেন, আর যাকে ইচ্ছে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৯৩ নং আয়াতের তাফসীর:

অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন। কেউ সত্য-সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, "তোমরা কাজ করে যাও, কেননা যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে ধরনের কাজ করা সহজসাধ্য করে দেয়া হবে"। [বুখারীঃ ৪৯৪৭, মুসলিমঃ ২৬৪৭]

সুতরাং বান্দার দায়িত্ব হলোঃ ভালো পথে চলার জন্য চেষ্টা করা এবং সে পথের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে সার্বক্ষনিক দো'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকলকে একই উম্মত তথা সকলকে হিদায়াত দান করে ঈমানদার ও মুসলিম বানাতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি, কারণ তিনি তাকেই হিদায়াত দান করেন যার মাঝে হিদায়াত গ্রহণ করার মানসিকতা ও প্রবণতা দেখতে পান। আর যার মাঝে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী প্রাধান্য পেয়েছে তাকে পথভ্রষ্ট করেন। এ সম্পর্কে পূর্বে কয়েক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আবার নিষেধ করলেন তারা যেন মানুষকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে শপথ না করে। যাতে চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে কারো পা পিছলে না যায়। আর তোমাদের এ পরিস্থিতি দেখে যেন কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত না হয়। আর তার ফলে তোমরা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথে বাধা দেয়ার পাপের শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন: أَيْمَانَكُمْ শব্দটি يمين এর বহুবচন, যার অর্থ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বাইয়াত করা। অর্থাৎ বাইয়াত করার পর যেন কেউ মুরতাদ না হয়ে যায়। কারণ তোমাদের মুরতাদ হওয়া দেখে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর এভাবে তোমরা দ্বিগুণ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে নিষেধ করলেন তারা যেন পার্থিব ব্যাপারে তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে। কারণ তাদের এই পার্থিব জিনিস থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট যা আছে তা অতি উত্তম। সুতরাং ওয়াদা ও শপথ ভঙ্গ করে যদি কেউ পার্থিব জিনিসের লোভ করে তাহলে সে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ....)

অর্থাৎ মানুষ পার্থিব জীবনে যা কিছু উপার্জন করে তা সবই শেষ হয়ে যাবে। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতের যে সকল নেয়ামত রয়েছে তা অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ)

"নিশ্চয়ই এটা হল আমার দেয়া রিযক, যা শেষ হবে না।" (স্ব-দ ৩৮:৫৪)

আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের কৃতকর্ম থেকে অতি উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّمَا يُوَفَّي الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

"ধৈর্যশীলদেরকে বে-হিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার ৩৯:১০)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে যে উত্তম ও চিরস্থায়ী প্রতিদান রয়েছে তার আশায় দীনের পথে অটল থাকতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হাসি-তামাসা করে শপথ করা যাবে না।

২. দুনিয়ার সকল জিনিস ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট যা আছে তা চিরস্থায়ী।

৩. ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন এ গুণের প্রমাণ পেলাম।